Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 700 - 707
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 700 - 707
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভ্রমণসূত্রে রানী চন্দের ব্যক্তি-ভাবনার বহুমুখিতা

সুমন কর
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চুনারাম গোবিন্দ মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট কলেজ
Email ID: sumankar709@gmail.com
0009-0004-0832-4461

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Travelogue, Renaissance, Santiniketan, Literature, Scripture, Consciousness, Rani Chanda, Quit India Movement.

Abstract
Travel literature has its own dimension. The analytical description of the various experiences gained from the places traveled by the author enhances the quality of literature. In the light of the bright educational spirit of the 20th century, new features have been formed in the travel narratives of women writers. Along with the narration, an opportunity has been found to compare the writer's personal thoughts with contemporary times. As a result, other issues have been intertwined with the local aesthetic sense in the literary base. Rani Chanda is a conscious and talented writer of this period.

Raised in the cultural consciousness of the upper world, Rani Chand's female mind is endowed with versatile analytical powers. From childhood, the surroundings of Santiniketan, including the proximity of Rabindranath Tagore, Abanindranath Tagore and of course Nandalal Bose; brought an atmosphere of new enthusiasm into her heart. Just as she has appreciated art like a true artist, she has made her personal thoughts clear to the reader through a perfect assessment of the overall scope through the process of travel. Immediately after her birth, she was successful in gaining experience by visiting various places.

The far-reaching scope of individual thought has been revealed through pilgrimages to religious places. The senses of scripture and contact with people who practice scripture have given stylistic elevation to the writer's language. She has always kept the native environment alive in his memory while traveling. Even though she was far from her birthplace, she repeatedly compared familiar image of her surroundings on her journey. The accurate portrayal of the overall context of the truth of life has made the work become dear to everyone. The differences in the personal characteristics of various people have been depicted in their true form.

As the writer's travelogue is closely associated with the Quit India Movement of 1942, a touch of socio-political themes can be found in it. Like a perfect woman's mind in the light of the Renaissance, she presented irrefutable arguments in religious thought. Her travelogues are not just memories of sight-seeing, but have prepared new experiences for the realistic eye. Rani Chanda's

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 700 - 707
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

unique personality makes her stand out from other writers. Her logical and insightful arguments on various topics add to the brilliance of the subject.

Discussion

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও সেই সঙ্গে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করে তোলার সামাজিক প্রচেষ্টার মধ্যে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের আধারে নবতর ধারা সংযোজিত হয়। ইতিপূর্বে পুরুষ রচয়িতাবৃন্দের ভ্রমণ সংক্রান্ত লিপিবদ্ধ বর্ণনা মুদ্রিত আকার গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু নারীর দৃষ্টিতে ভ্রমণ স্বরূপের নবতর ব্যাখ্যারও প্রয়োজন ছিল। উনিশ শতকে এসে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটে, বাংলার গৃহস্থ নারীকুল ব্যক্তি-স্পর্ধাকে হাতিয়ার করে গৃহগণ্ডী অতিক্রম করে ও নতুন জগতের বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। শুরুটা উনিশ শতক থেকে হলেও বিশ শতকে উপস্থিত হয়ে নারীর ব্যক্তি-হস্তের লিখনি-শক্তি সুউচ্চ মান স্পর্শ করে। ভ্রমণ সাহিত্যের অন্দরে কেবল উচ্ছ্বাস ও আনন্দানুভূতি মুখ্য হয়ে ওঠেনি, নারী-দৃষ্টির বিশ্লেষণী সক্ষমতার পরিচয় লাভের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। শুধু দেখার জন্য দেখা মাত্র নয়, পরিসরকে নবতরভাবে উপলব্ধি করে ও অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যে দিয়ে সমাজের আশু পরিবর্তন সাধন করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করার মত ছিল।

বিশ শতকের অন্যতম নারী সাহিত্যিক রানী চন্দ। যথার্থ স্বরূপেই শিল্প-গুণান্বিত ও আদর্শ দ্রষ্টার বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ নারী মানসিকতা সম্পন্ন একজন লেখিকা। তিনি শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সান্নিধ্য সূত্রে বহির্জগত দেখার অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। সমসাময়িকতা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টি প্রকাশে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সেই সূত্রে রাজনৈতিক পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন। জেল-বন্দি অবস্থা তাঁর ব্যক্তি-চিন্তায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক রূপ-চিত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠার ফলশ্রুতি স্বরূপ তাঁর চিত্র-শৈলীতে এসেছে বাস্তববোধের স্পর্শ। তাঁর চিত্রগুলি সামাজিক দলিল, আত্ম-চিন্তার শিল্পগত বহিঃপ্রকাশ। ভ্রমণ সূত্রে বর্ণনার মধ্যেও সেই শৈল্পিক ভাবনার স্বরূপ খুঁজে নেওয়া গেছে। তাঁর ভ্রমণ-কৃত পরিবেশগুলি বর্ণনা সূত্রে চেতন-সমৃদ্ধ হয়ে নতুন পরিচয় নিয়ে হাজির।

রানী চন্দের জন্ম মেদিনীপুর জেলায় হলেও পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা শহরে চলে আসেন। পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক জীবন-নীতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন। ভ্রমণ বিষয়টির প্রতি জন্মসূত্রেই তাঁর আকর্ষণ ছিল। তাঁর বড়দাদা মুকুল দে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জাপান যাত্রায় সঙ্গী হয়েছিলেন; অর্থাৎ জীবনের বিবিধ পর্যায়ে লেখিকা ভিন্ন পরিসর অনুভবে সমর্থ ছিলেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ভ্রমণের পূর্বে, পারিবারিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর রচনায় সক্রিয় ভিত প্রদান করেছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়-পর্বে দেশের বুকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল বেশ অনুভবগম্য। সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক অস্থিরতার ছবিও স্পষ্ট হয়েছিল। সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব বিষয়টি সাধারণ মানব জীবনের অসহায়তাকে বড় বেশী প্রকট করে তুলেছিল। সাধারণভাবে ভ্রমণের অন্দরে ভ্রমণকারী ব্যক্তির নিজস্ব আনন্দ-অনুভূতির বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে; কিন্তু রানী চন্দের বিচক্ষণতা, দূরদর্শী স্বভাব-চেতনা ভ্রমণ সাহিত্যে সমাজ-ভাবনার যেরূপ মূল্যায়ন হাজির করেছে; তা এক অর্থে অনবদ্য। বিশ্লেষণী দক্ষতার পাশে যুক্তি মিশ্রিত বক্তব্যের সুদৃঢ় উপস্থাপন লেখিকার ব্যক্তি-চিন্তার স্বরূপকে স্পষ্ট করে তোলার নিমিত্তে যথেষ্ট বলেই বোধ হয়।

নারী-সমুন্নতি প্রসঙ্গ বারংবার আলোচিত হলেও, নারী সম্পূর্ণ রূপে গৃহ-মুক্ত কখনই ছিল না। বিবাহের মধ্যে দিয়ে গৃহের বন্ধন আরও বেশী সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। বিবাহিত নারী মনের চিরন্তন বার্তাটি লেখিকা স্পষ্ট করে তোলেন। সংসারী নারী জীবনে বহির্গমনের পথ সংকীর্ণ হলেও, ব্যক্তি উদ্যম ও অগ্রগতির মানসিকতা কেবল ভ্রমণকে সফল করে থেমে থাকে না; সাহিত্যের আধারকেও সমৃদ্ধ করে তোলে। নারী সংসারী হয়ে উঠলেও তাঁর অন্তর-ইচ্ছা বারংবারই আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজে ফেরে। নতুন কিছুকে উপলব্ধি করার ব্যক্তি আবেগে নারী হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র, ঠিক সেই পথেই সংসারের গুপ্ত বন্ধনগুলিকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে রানী চন্দ ধর্মস্থান ভ্রমণ করে ফিরেছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 700 - 707
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রানী চন্দের প্রবন্ধ উল্লেখ সূত্রে 'পূর্ণকুম্ভ', 'হিমাদ্রি' গ্রন্হ দুটি আলোচনার আধারে উপস্থিত করা হয়েছে। উভয় গ্রন্থ তীর্থস্থান ভ্রমণের প্রেক্ষাপটে আলোচিত; কিন্তু ধর্মস্থান ভ্রমণ কালে সনাতনী হিন্দুধর্মের প্রভাবে ব্যক্তি-মনকে আচ্ছাদিত না রেখে উন্মুক্ত চেতনা সমৃদ্ধ দৃষ্টি-যোগে, তিনি ধর্মতত্ত্বের যৌক্তিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। পরিবর্তিত পরিসরের নিখুঁত দৃশ্যায়নটি শিল্পীস্বরূপ ভাবনায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। তীর্থস্থান ভ্রমণকালে ব্যক্তি-বিবেকের সদা-জাগ্রত স্বরূপটি পাঠক সমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। লেখিকা যেন বাংলাদেশের প্রচ্ছন্ন স্বরূপকে ভ্রমণ-কৃত স্থানের ভাসমান চিত্রগুলির সঙ্গে সদা মিলিয়ে দেখতে প্রস্তুত থেকেছেন।

বাংলাদেশ শস্য-শ্যামলা ভূমি কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে অভিশাপের ন্যায় অন্নাভাব এসে হাজির হয়েছে। দুর্ভিক্ষের প্রভাবে সমাজের এহেন ক্ষীণপ্রায় দশা তাঁকে ভাবিয়ে তোলে –

> "যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ অজন্মা দারিদ্র্য মারামারি কাটাকাটি পর পর বয়ে গেছে বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে-গ্রাস করেছে সমস্ত ঐশ্বর্য তার।"[১]

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রাণশক্তির উপর তৈরি হয়েছে আশঙ্কা –

> "ভয়ে মরি-যে ক্ষীণ প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করে তাদের বুকের পাঁজর ঠেলে-কতদিন তারা টিঁকবে এ জগতে!"[২]

অন্যদিকে উন্নত শির-ধারী বাঙালি সত্তা আজ ছিন্নমূল হয়ে জাতি ও ধর্মের নামে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার পাশে জাতি ও ধর্মের মেরুকরণের মত বিষয়টি বর্তমান পরিস্থিতিকে আশঙ্কাজনক করে তুলেছে। শহর কলিকাতার দাঙ্গার নির্মম ছবি হরিদ্বার ও কেদার-বদ্রি ভ্রমণকালে ভ্রমণকারী মানুষের বক্তব্যে ধরা পড়েছে। স্বাধীনতা এসেছে, ভারতবর্ষ আজ বিদেশী শাসন মুক্ত কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রশ্নে একটা বড় দাগ সর্বত্র থেকে গেছে। একটি স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে দেশের ভিতরে এসেছে বিভাজন, বদলে গেছে স্থানের নাম জাতির পরিচয়ে; ভিটে-হারা মানুষের দল আজ পরিচয়ের থেকে বেঁচে থাকার তাগিদকে বড় করে দেখেছে। স্বদেশ স্বভূমে পরবাসী মানুষের দল – "...-হাত পেতে চেয়ে খাওয়ার বদলে।"[৩] পরিচয়হীন জীবনে সামান্য কর্মকে সঙ্গী করে বেঁচে থাকার রসদ গ্রহণে তৎপর; এ ছবি প্রমাণ করে মানুষ আত্মগ্লানিকে স্বীকার করেও আত্মসম্মান বিসর্জনে নারাজ। জঠরের ক্ষুধার নিকট সবকিছু ফিকে মনে হয়। অন্য-পরিসরে হাজির হয়ে পুরাতন ব্যক্তি-পরিচয় ফিরে পাওয়ার তাগিদে মানুষের লড়াইকে স্বাগত জানাতেই হয়।

ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্রগুলিতে সর্বস্থানে ছড়িয়ে আছে সমকালীনতার নগ্ন ছবি, সেই ছবিগুলিকে গোপনে না করে, সেগুলির স্পষ্ট স্বরূপ গ্রন্থের অন্দরে বর্ণনায় তুলে ধরা আছে। মানুষের ব্যক্তি রুচি ও কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি-স্বরূপ প্রকৃতি তার নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে; হরিদ্বারের পথে তাই সুবিস্তৃত গঙ্গার ছবি বদলে গিয়ে ঘোলা জলের স্বরূপে ধরা দিয়েছে। ব্যক্তি সমুন্নতির বিকশিত ধারার সামনে প্রকৃতির সরল রূপচিত্র বিকৃত হয়ে পড়ে।

গৃহী রমণীর ধর্মপথে অগ্রগতির বিষয়টি সর্বকালে ও সর্বসময়ে সংকুচিত হয়েছে। নারীর একাকী বাইরের পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি সামাজিক দৃষ্টিতে কলঙ্ক হিসাবেই গণ্য হয়; সেইস্থানে সংসারী নারীর সাধ্বী-জীবনে সর্বসম্মতি থাকবে, এমন ভাবনা বজায় রাখাটাই ভুল বলে বিবেচিত। তবে গৃহী জীবনের তুলনায় ধর্ম-পথের পরিধি বহুবিস্তৃত বলেই অনুভবগম্য; কিন্তু সেই পথে অগ্রসর হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়কালে নারী মনে তৈরি হয় প্রভুত্বের ধারণা। ধর্ম ভাবনায় ঐশ্বরিক সান্নিধ্য জনিত অনুভূতি লুপ্ত হয়ে ধর্মের বুকে অধিকার বজায়ের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সাংসারিক-ভাবে অবদমিত নারী-মন ধর্ম পথের বিশালতার সম্মুখে নিজ ভার অর্পণ করে মুক্তি-কামী হয়ে ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলে কিন্তু আত্ম অহং থেকে মুক্ত হতে না পেরে, ধর্ম-পথে থেকেও মুক্তির স্বাদ গ্রহণে ব্যর্থ হন।

বাঙালি নারী-মন ধর্মপ্রাণা, তবে 'ধর্ম' শব্দটি বর্তমানে নিজ তাৎপর্য হারিয়ে আচার-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। লেখিকা ভ্রমণ সঙ্গিনী বড়দিদির প্রসঙ্গ সূত্রে নারীর ধর্মভাবনার স্বরূপকে পরিষ্কার করেছেন –

> "বড়দির ভগবানের করুণার কূলকিনারা পাই না। উঠতে বসতে শুনি তাঁর করুণার মহিমা।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 700 - 707
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেবতার সম্মুখে নিবেদিত খাদ্য-দ্রব্যাদিকে প্রসাদ-স্বরূপে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণের তাগিদ থেকে শুরু করে, আরতির কার্যে নিয়োজিত আলোকরাজি থেকে নির্গত ধূম; সবই প্রায় দেবতার স্পর্শ লাভের মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়। নারী-মনের এহেন ভক্তি-বৎসল ভাবনা খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়; কিন্তু সমস্যা তখনই প্রকট হয়ে ওঠে যখন আয়োজন ভক্তির নমনীয়তাকে অতিক্রম করে ফেলে। লেখিকা এ প্রসঙ্গে অনেকবেশী যুক্তিনিষ্ঠ ও আত্ম-সচেতন মনের পরিচয় রেখেছেন এবং ধর্মীয় আচার-সর্বস্বতাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অস্বীকার করে, ধর্মভাবনার মূল বিষয়টিকে মূল্য দিয়েছেন।

ধর্ম-ভাবনায় জড়িয়ে থাকে সংস্কারের স্পর্শ। মানুষের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হয়ে থাকার বিষয়টি সে প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; অথচ প্রসঙ্গহীন হয়ে ওঠে মানুষ ও মনুষ্যত্বের তাৎপর্যটুকু। একথা যুক্তিসঙ্গত যে 'পবিত্রতা' শব্দটি আসলে আপেক্ষিক স্বরূপেই ব্যবহৃত। ব্যক্তি মানুষের জন্মের প্রারম্ভিক মুহূর্ত থেকেই শরীরে বিরাজ করে যাবতীয় অপরিচ্ছন্নতা। এই অপরিচ্ছন্নতা বিষয়টি 'শারীরিক' ও 'মানসিক' সব ক্ষেত্রেই বিবেচ্য; সেই স্থলে কেবলমাত্র মানুষের শরীরের বাহ্যিক অশুচিতাকে বেশী গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। অনাবশ্যক-ভাবে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আত্মনিয়োগ করলে, মূল বিষয়টি স্বধর্ম হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে আচারসর্বস্ব ধর্ম-ভাবনায় ব্যক্তিমানুষের বাহ্য পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠেছে, সেই সূত্রেই অবাঞ্ছিত বিষয়গুলি বড় বেশী স্থান করে নিয়েছে। ভক্তি-স্বরূপের তাৎপর্য অনুসন্ধানে লেখিকার আত্ম-বিশ্লেষণ প্রশংসার দাবি রাখে।

ধর্মের অন্দরে যে পবিত্রতার স্পর্শ লুকিয়ে আছে, তা অনুভব করার উদ্দেশ্যে সাধ্বী রমণীবৃন্দ গৃহত্যাগী হয়েছেন। ধর্মীয় পবিত্রতাকে স্পর্শ করার অনুভূতি অনির্বচনীয়, সেস্থানে শঠতার ঠাঁই নাই। একনিষ্ঠ হয়ে নিবেদিত প্রাণে পূজা নিবেদনের মধ্যে দিয়েই অসীমের স্পর্শ লাভের সহজ সত্যটি লেখিকা তুলে ধরেছেন। তবে মনের অন্দরে যদি ভীরুতা প্রশ্রয় নিয়ে বসে, তখন অসৎ-এর প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। মনকে ধমকে, শাসিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতা কখনই পুণ্য-প্রাপ্তির পথকে প্রশস্ত করতে পারে না। ভীরু মানসিকতাকে সঙ্গে নিয়ে, যুক্তিহীন দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করে পুণ্যভূমিতে মুক্তি-প্রার্থনা আসলে মেকী বলেই মনে হয়। যা অনাদি তাই সত্য, সত্যকে অস্বীকার করে নয় বরঞ্চ স্পষ্টবাদী ও স্পষ্ট-ভাষী হয়ে মিথ্যার বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে দিয়েই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ ও মনুষ্যত্বের আদর্শ সংজ্ঞা নির্ধারিত হতে পারে। অসীমের প্রতি মানুষের আত্ম-সাধনায় কোন খাদ কাম্য নয়। ব্যক্তি-বিকাশের মূল-মন্ত্র এখানেই আত্ম-নিহিত হয়ে আছে। ভগবৎ ভক্তির নিমিত্তে, সাধনায় মুক্ত মনের অনুভূতি একান্ত প্রয়োজন।

সংস্কারী চেতনা সদাই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। 'ধর্ম' কথাটি মানুষকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়, মানুষকে অতিক্রম করে ধর্ম নিজ সংজ্ঞা প্রস্তুত করতে পারে না। ধর্মের ভিন্নতা মনুষ্যত্বের স্বরূপে যেন চিড় ধরাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। ধর্মপথে ব্যক্তির সাধনা তাঁর লিঙ্গ অনুসারে নির্ধারিত হতে পারে না; আত্মিক সাধনায় ধর্মের বিকাশ সম্ভব। ধর্মপথে অগ্রসর মানব-সত্তার সমৃদ্ধির মূল শর্ত হল মনকে জটিলতা মুক্ত করে নিরবচ্ছিন্ন হিসাবে তুলে ধরা।

যথার্থ স্বরূপে নারীকে সামাজিক দিক হতে যদি সম্মানিত করার প্রয়াস থাকে, তবে পুরুষের সমকক্ষ করে তা করা সম্ভব হবে; কিন্তু নারী সমাজে প্রগতির কথা উঠলেও পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা প্রাপ্তি বিষয়টি অনেকটাই দূরে থেকে গেছে –

> "...সব মিলিয়ে না জানি কী এক নিদারুণ ইতিহাস অতীতের।"[৫]

মর্ত মানুষের জীবন-রীতির এই ছবি আধ্যাত্মিক স্তরেও লক্ষ্য করা গেছে, সেই হেতু কৃষ্ণের পার্শ্বে রাধারানীকে স্থান দেওয়ার প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণ পূর্বে অস্বীকৃত ছিলেন; কিন্তু জাহ্নবাদেবীর শাস্ত্রীয় যুক্তির নিকট পরবর্তী সময়ে এহেন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় ও রাধারানীর স্থাপনা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে করা হয়। আসলে ভালোবাসা লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে স্নেহ দান করা যায় না, তাই পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব সমাজ রাধাভাবে-সাধনা বিষয়টিকে নিজেদের আরাধ্য করেন। আত্ম-নিয়োজিত হয়ে দেব-সেবার শিক্ষা বৈষ্ণবগণ নারী মানুষের নিকট লাভ করেছিলেন। মর্তবাসী মানুষের সংস্কারী ভাবনার স্পর্শ থেকে তাঁদের আরাধ্য দেবতাগণও মুক্ত হতে পারেন নি। সংস্কারের এহেন ছোঁয়াচে রোগ আধ্যাত্মিক স্তরে সহজেই নিজেকে মেলে ধরেছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 700 - 707
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাধনার স্তরেও তাই এহেন প্রভাবের দেখা মেলে; পরবর্তী সময়ে নীতি কিছুটা পরিবর্তিত হলেও, আত্ম-সাধনার মুক্ত পরিসর সর্বোপরি দেখা যায় না।

নারীর ব্যক্তি-সাধনায় সাধ্বী রমণীর তন্ময় স্বরূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভ্রমণ সূত্রে লেখিকা সাক্ষী থেকেছেন এই রকম সব বিশেষ মুহূর্তের; যেখানে ধর্মপথে নারীর আত্মপ্রকাশ হয়ত হয়েছিল সংসারের বন্ধন মুক্তির কামনায়, কিন্তু সাধনার পথে আজ সে নারী একান্তভাবেই ভগবতপ্রাণা। সামাজিক সভ্যতার অধঃপতিত চেহারার সামনে প্রায় অসহায় নারী সমাজের নিকট ধর্মের এহেন পথ সমাধানসূত্র নিয়ে হাজির। নারী-মানুষও আজ দেবতার স্বরূপে কাঙ্ক্ষিত মানুষকে খুঁজে নিয়েছে।

নারী মনের ব্যক্তি-ইচ্ছা সর্বদা জনসমক্ষে হাজির হয়ে ওঠে না। বিশেষতঃ সামাজিক কিছু রীতির সামনে পড়ে নারী অবদমিত হয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ মিশন নারী বর্জিত স্থান, পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এই মঠে অন্যস্বরূপের গরিমা বিরাজ করে; কিন্তু সেই স্থানে নিজ হস্তে আলপনা প্রস্তুত করতে না পারার গ্লানি লেখিকাকে অন্তর থেকে চরমভাবে আঘাত করেছিল। ব্যক্তি মনের যন্ত্রণা ও গ্লানিকে সঙ্গে নিয়ে এহেন আচারের মৌন বিরোধিতায় তিনি সামিল হয়েছিলেন –

> “পুরুষের কঠিন হাত সগৌরবে নিপুণভাবে ক্ষুণ্ণ করে মেয়েলি-হাতের প্রয়োজনকে। মনে মনে হার মানি আর জ্বালা অনুভব করি।”[৬]

ব্যক্তি কামনার প্রবল তাড়নার নিকট মনের গুপ্ত বাসনা নিজ স্বরূপে আত্ম-বিকশিত হয়; এই সূত্র ধরেই তিনি আলপনা শৈলীর সূত্রে নারী বিবর্জিত স্থানে নিজ স্পর্শ তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দেশভাগ মানুষের মনে আঘাতের চিরস্থায়ী চিহ্ন এনে হাজির করেছে। মানুষ একদিকে যেমন স্বভূমিতে পরবাসী ঠিক তেমনিভাবে সামাজিক নারী জীবনে এসেছে অত্যাচারের ভয়াবহ ছায়া। নারীর ব্যক্তি সংগ্রাম কেবল আত্ম-পরিচয় সংকট হেতু নয়, ব্যক্তি-নিরাপত্তা বিষয়টি অনেকবেশী প্রাসঙ্গিক। ভিন্ন জাতির পরিচয়ে নারী-সত্তা আজ বিধর্মীর নিকট বড় সহজলভ্য। লেখিকা স্বয়ং নারী হয়ে নারী-মনের এই সহজ সত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন ও আত্মগ্লানি অনুভবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন –

> “দেশ ভাগ হয়ে গেল, দুর্বৃত্তের টালা-নিতে ইজ্জত রাখতে পারে না আর।”[৭]

পরিচয়হীন মানুষের দল উদ্বাস্তুর ন্যায় ভিড় জমিয়ে তুলেছে নতুন ভূমির বুকে। অচেনার ভিড়ে ব্যক্তি-পরিচয় পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে এক সংগ্রামী চেতনা সদা কার্যকরী থেকেছে। মানুষের ব্যক্তি-ভাবনার স্বার্থপরতার মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশে মনুষ্য-চেতনা আজ অধঃপতিত হয়েছে। তীর্থ ভ্রমণে এসে এক বিধবা রমণীর মুখে ফুটে উঠেছে অন্তর যন্ত্রণার আর্তনাদ –

> “আঁচলে চোখ মুছে বিধবাটি বললেন, ‘আর কন ক্যান। সোনার বাড়ি, সোনার ঘর; উড়ি পুড়ি ধুড়ি দিয়া চইল্যা আসলাম, সে কি কম দুঃখে?’ ”[৮]

ভ্রমণ সূত্রে পাহাড়ের কোলে প্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত অষ্টভুজার মূর্তি দর্শনে লেখিকার ভ্রমণ-সঙ্গিনী বড়দিদি পূর্ববঙ্গীয় নারী-সমাজের চিত্র তুলে ধরেন। এহেন বর্ণনার অন্দরে দ্বিবিধ ভাবনা গাঁথা হয়ে আছে। একদিকে পাহাড়ের গহীনে আত্মগোপন করে থাকা দেবীমূর্তি যেন নারীর সমাজ অবহেলিত রূপচিত্র তুলে ধরেছে অন্যদিকে নারীকে দেবীর সঙ্গে তুলনা করার প্রয়াস চোখে পড়েছে। সমাজ যেখানে জাতি-ভেদে দীর্ণ, মনুষ্যত্বের প্রশ্নে মানুষ যেখানে সন্দিহান; সেখানে মুক্তি-কামনার তাগিদে মানুষের তীর্থ-দর্শন কতখানি সফল হবে? তা প্রশ্নচিহ্নের মাঝে এসে উপস্থিত হয়।

‘হিমাদ্রি’ প্রবন্ধে লেখিকার যাত্রা কেদার-বদরীর উদ্দেশ্যে। সমাজ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়, নারীর ব্যক্তি-ইচ্ছা প্রকাশের স্বাধীনতা কিছুটা হলেও অবরুদ্ধ। স্ত্রীর প্রতি অনৈতিক আচরণ লক্ষ্য করেও পুরুষের অন্দরে প্রতিবাদী ভাবনার শিথিলতা; সমাজের কলঙ্কিত স্বরূপকেই তুলে ধরে। এককথায় নারী-মানুষের শ্লথ-জীবন গতি বড় বেশী চোখে পড়ার মত বিষয়। প্রায় সমসাময়িক সময়ে রচিত ‘পূর্ণকুম্ভ’ ও ‘হিমাদ্রি’ প্রবন্ধে তুলনামূলকভাবে সম-পরিস্থিতির দর্শন মেলে।

ব্যক্তি মানুষের অন্দরে পারস্পরিক সদ্‌-ভাবনা আজ বেশ কিছুটা অস্তমিত। আন্তরিক স্বরূপে অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার স্থলে ব্যক্তি-স্বার্থ বড় বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। ভ্রমণ সূত্রে লেখিকা মানুষের বিবেকহীনতার ছবি দেখেছেন, যেখানে মানুষ অপর মানুষের জীবন বাঁচানোর পরিবর্তে তাঁর সম্পদের লোভে বিনাশকারী হয়ে ওঠে। সমাজ ও মনুষ্যত্বের ভিত ক্রমাগত দুর্বল হয়ে চলেছে। মানুষ নিজ অজান্তেই নিজ অন্তরে লালন করছে বিনাশের বীজ। তীর্থভূমির মুক্তিকামী পরিবেশের মধ্যেও সেই বিনাশকারী পরিবেশের অশনি সংকেত লক্ষ্য করা গেছে।

সংসারী নারী-সত্তার তপস্যার মাধ্যমে মুক্তিক্ষেত্র যেন রন্ধনশালা। যাবতীয় ব্যক্তিবাসনা, আবেগের মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশের আশ্রয়স্থল হিসাবে ওই স্থান চিহ্নিত। লেখিকা নিজ দিদিমার কথার সূত্রে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন –

> “রান্নাঘরের মতো এমন গোপন তপস্যার কুঠি আর বুঝি কোথাও মেলে না মেয়েদের।”[৯]

তবে সময় পরিবর্তিত হয়েছে নারীর মত প্রকাশে এসেছে স্বাধীনতা। পূর্ব সময়ে বাল্যবিবাহের দৌরাত্ম্যে শিশুকন্যার মনে জাগ্রত ভীতি ও সেই সঙ্গে নতুন পরিসরে শ্বশুর গৃহের আচরণে বাল্য গৃহবধূটির অবস্থা হয়ে উঠত বেশ শোচনীয়। ঘোমটার আড়ালে শ্বশুরবাড়ীর নজরবন্দী সেই বাল্য গৃহিণীর দৈন-দশার চিত্র আজ প্রায় দেখা যায় না। বর্তমানে স্বাধীন নারীর ব্যক্তি-মূর্তি প্রোজ্জ্বল ও আলোকায়িত।

সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি হেতু নারী জগতের উন্নতি একান্ত-ভাবেই কাম্য। সার্বিক বিকাশ-সূচক মানসিকতার অন্দরে একটি জাতির মান-উন্নয়নের পরিচয় মেলে; কিন্তু হঠাৎ ভেদাভেদের মাত্রাতিরিক্ত আত্মপ্রকাশ সামাজিক আতঙ্কের কারণ হিসাবে দেখা যায়। সম্প্রদায়ভেদে মানুষের মাঝে পার্থক্যের গণ্ডী পূর্বে সেরূপে দেখা না গেলেও স্বাধীনতাত্তোর পর্যায়ে বড় বেশী চোখে পড়ার মত। রাজনৈতিক মুনাফা লাভের তাগিদে সম্প্রদায়গত বিভেদ সৃষ্টি কেবল ক্ষতিকরই নয় অসাংবিধানিকও বটে। ধর্মীয় প্রসঙ্গ হাজির করে মানুষের অন্দরে প্রতিনিয়ত আতঙ্কের পরিবেশ নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ ‘ধর্ম’ বিষয়টিকে মানুষ প্রশান্তির কারণ হিসাবে না বিবেচনা করে বিনাশের ভিত্তিভূমি করে তুলছে। আসলে ‘ধর্ম’ শব্দের বিপথগামী অর্থের ফলশ্রুতি হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝে বিভেদের স্বরূপটি বেশ স্পষ্ট। মনুষ্যত্বের তাৎপর্য মুছে গিয়ে শত্রুতার গুপ্ত প্রতিধ্বনি সেখানে শুনতে পাওয়া যায়। ভ্রমণ কালে এক বয়স্ক পাহাড়ির মুখে এহেন পরিসরের ছবি ফুটে উঠেছে –

> “...সব ভাই-ভাই। বুঝবার জো ছিল না কে হিন্দু কে মুসলমান। কেবল ‘আদাব’ আর ‘নমস্কার’ এই মাত্র তফাত ছিল। এখন শুনি এ ওর দুশমন।”[১০]

পরিসরের বর্তমান প্রতিবিম্ব অতীত ছবিকে বিস্মিত করে তোলে, পাহাড়ি সেই মানুষটির কথার সূত্রে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যায় –

> “ ‘সে রাজ্যই আলাদা। সবাই কী চালাক। কত তাদের কাজ। মুসলমান–পট্টিতে ছিলাম, হিন্দুও অনেক ছিল, ...।’”[১১]

আত্ম অহংকারী মানব-সত্তা অজান্তেই নিজ ভাইয়ের রক্তেই আত্মতৃপ্তির স্বাদ গ্রহণ করে চলেছে; পরিচয় হারিয়ে এই মানুষের দল নররূপী পিশাচে রূপান্তরিত। তীর্থদর্শন সূত্রে এহেন মানবকুলের আত্মমুক্তির তাগিদ, কেবলমাত্র অন্তঃসারশূন্যতা ভিন্ন আর কিছু নয়। মানুষ মুক্ত হতে আগ্রহী থাকলেও ‘অহং’-এর তাড়নায়, বিবিধ বন্ধনে নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে; এই পথে মানুষের যথার্থ মুক্তি কি আদৌ সম্ভব? সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

তীর্থ-যাত্রী মানুষের তীর্থদর্শন বিষয়টি বিবিধ মানসিক পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গৃহী মানুষ তীর্থযাত্রার মধ্যে পুণ্যপ্রাপ্তীর তাগিদ খুঁজে ফেরে, কিন্তু খুঁজে দেখলে বোঝা যাবে; সংসারের কড়া শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত প্রাণসত্তা আসলে কিছুটা সময় ব্যয় করে ব্যক্তি-জীবন পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে। ভ্রমণ সূত্রে শশী মহারাজের কথায় সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ মেলে – “জীবন পরিষ্কার রাখা চাই।”[১২] জীবন নীতির সঙ্গে সমর ক্ষেত্রের খুব বেশী পার্থক্য থাকে না। উপযুক্ত পরিকল্পনা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতার মধ্যে দিয়েই জয়লাভ হয়। তীর্থস্থান ভ্রমণ সূত্রে পুণ্যপ্রাপ্তীর মাত্রা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 700 - 707
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নির্ধারণ সম্ভব নয়; কিন্তু মানব যদি নিজ অন্তরে তীর্থ স্থাপনে প্রয়াসী হয়, তবে পুণ্যভূমিতে ভ্রমণ ব্যতিরেকে নিজ শুদ্ধি ও সমৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। মানুষকে নিজ প্রচেষ্টায় মনের অন্দরে দেবভূমি নির্মাণ করতে হবে; এই সূত্রেই দেবত্বপ্রাপ্তী ও আত্মশুদ্ধি দুইই সম্ভব হবে। তীর্থ ভ্রমণকে লঘুতার সঙ্গে বিবেচনা না করে, অসীমের নিকট মানুষের আত্মসমর্পণের মাধ্যম হিসাবে গণনা করা প্রয়োজন।

মানুষের বিশ্বাসের সূত্রে তীর্থের তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়ে থাকে। একদিকে যেখানে দেবতার দর্শন প্রাপ্তিকে পুণ্য অর্জনের মাধ্যম ধরা হয়েছে, ঠিক তখন অন্যদিকে আরেকদল মানুষ দেশীয় বীর নায়কবৃন্দকে স্বচক্ষে অনুভব করে জীবনে পুণ্যতা প্রাপ্তীর আস্বাদ খুঁজে নিয়েছেন। লেখিকা ভ্রমণ সূত্রে সুভাষ বসুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত প্রৌঢ়র মুখে দেশনায়কের প্রসঙ্গ শ্রবণ মাত্রই অন্য স্বরূপের ধারণা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উক্ত প্রৌঢ়র নিকট দেবতার সান্নিধ্য থেকেও দেশনায়কের স্পর্শ বড় বেশী রকমের পুণ্য লাভের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল –

> " '...দেবতার সঙ্গসুখ-সে কি বেশিদিন ভাগ্যে ঘটে? তাই দেবতা গেলেন তাঁর স্থানে, আমরা ফিরে এলাম আমাদের জায়গায়।' "[১৩]

মাহাত্ম্য নিয়েই অলৌকিক ক্ষমতাধারী দেবতা অসীমতার নামান্তর হয়ে ওঠেন, অথচ সেই মাহাত্ম্য যখন মানুষের অন্দরে খুঁজে নেওয়া চলে তখন মূর্তির নিকট ছুটে যাওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। জীবন সত্যের কঠিন তাৎপর্য স্পষ্ট হয়েছে। সাধারণ ভাবে মানব জীবন তুচ্ছ, সেই হেতু জরা-ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি প্রাপ্তির আশা নেই। জগতের সব কিছুই অস্থায়ী, মানুষের ব্যক্তি-প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে বিষয়ের মান নির্ধারিত, ফলে ব্যক্তি মানুষের আত্ম-শ্লাঘার স্থান খুবই সংকুচিত। সুখ ও দুঃখের ন্যায় বিষয়গুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মানবজীবন যুক্ত। এই দুঃখ নামক সাগরের বিশালাকার পথ অতিক্রম করার সক্ষমতা মানুষকেই অর্জন করতে হবে। লেখিকা শশী মহারাজের কথার সূত্রে এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন –

> "ব্যথা মানুষের পেতেই হবে, তার হাত থেকে নিস্তার নেই।"[১৪]

মহারাজের এই কথাগুলি শাস্ত্রবাক্যের বক্তব্যকে স্মরণ করিয়েছে -

> "সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতিকারপূর্বকম্ চিন্তাবিলাপরহিতং,
> তাং তিতিক্ষস্ব ভারত।"[১৫]

সত্যকে স্বীকার করে জীবন নীতির আদর্শের প্রতি নমস্য স্বভাব পোষণ করতে হবে।

দেশভাগ নারী মানুষের নিকট ভয়ংকর স্মৃতি নিয়ে হাজির। আলোচনার পূর্বেই একথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই অসম লড়াই কেবল আত্ম-পরিচয় পুনর্গঠনের জন্য নহে, আত্মসম্মান রক্ষা করার তাগিদেও; অথচ যে পুরুষ-সমাজ নিয়ন্তা সেজে বসে আছে, যার হাতে নারী সুরক্ষার দায়ভার, সে নিজেই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে মুখ বুজে নির্যাতনের ভয়াবহতার সাক্ষী সেজে রয়েছে; ফলে নারীর সম্মান ধূলি-লুণ্ঠিত। লজ্জাশূন্য দৃষ্টি নিয়ে মানব-সমাজ নারীর সম্মুখে আজ কলঙ্কিত। দীর্ঘ সময়ের সামাজিক লাঞ্ছনা নারী মনে হাজির করছে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ার অনুভূতি; সামাজিক বিকাশের পথে যা বেশ বড় রকমের অন্তরায়। নারী-সমাজের প্রতি পুরুষতান্ত্রিকতার এহেন উদাসীন দৃষ্টি সহজে কাম্য নয়।

গৃহী নারী-মানুষের ধর্মপথে যাত্রী হয়ে ওঠার গল্পে রহস্য লুকিয়ে থাকে। কেবল সংসারী জীবনের প্রতি নিরাসক্ত মানসিকতা এ প্রসঙ্গে কার্যকরী নয়, বরঞ্চ সংসারের যাতনা থেকে মুক্তিকামী চেতনা নারীকে সর্বদা চঞ্চল রেখেছে। অসীমকে স্বীকার করে নতুন কিছু প্রাপ্তির তাগিদে এই ছুটে চলা আসলে নারী মনের গোপন আর্তনাদকে মনে করিয়ে দেয়। গৃহী মানুষের ধর্মপথগামী চেতনা কিংবা পুণ্য অর্জনের সাপেক্ষে তীর্থ ভ্রমণে আগত মানুষজনের মধ্যেই অসহায়তা স্বরূপ মন-যন্ত্রণা অনুভব করার মত। ঠিক সেই কারণেই অসীমের মাঝে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বড় বেশী করে তাদের মনে ক্রিয়াশীল থেকে যায়। আসলে বদ্ধ-আত্মা মুক্ত হতে চায় বিরাটের স্পর্শে।

সংসার জীবনের যাবতীয় মায়ার আবরণ যুক্ত মানবাত্মা আজ নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হয়ে থাকে। সাধনার মধ্যে দিয়েই মুক্তিকামী ওঠা সম্ভব, সংসারত্যাগী সাধকবৃন্দ কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তিপথের অন্বেষণে তৎপর; অন্যদিকে সংসারে থেকেও দুঃখ ভোগের মধ্যে দিয়ে মানুষের নিরন্তর সাধনা চলছে। কেবলমাত্র ত্যাগের পথ ধরেই মানুষ আত্ম-মুক্তির সাধনায় সফল হতে পারেন, কিন্তু এহেন ত্যাগের ভাবনাকে ব্যক্তি-স্বার্থ মুক্ত হতে হবে। সম্পর্কের বন্ধনদশার নিরর্থক স্বরূপ অনুভব করেও, মানুষের এহেন ব্যক্তি-ইচ্ছাকে নস্যাৎ করা যায় না। উচ্চমার্গের সাধনার পথ ধরেই মন, মুক্ত হওয়ার অনুভূতি লাভ করতে পারে।

ভারতের স্বাধীনতা, দেশভাগের ভয়ংকর পরিবেশ, বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণাম; সমাজের বৃহদায়তন ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে কিছুসংখ্যক কুসংস্কার সমাজ-ব্যবস্থাকে ভিতর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছিল। লেখিকা পুণ্যভূমি ভ্রমণে বেড়িয়ে বেশ কিছু প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখেছেন সামাজিক ক্ষতের প্রতিকায়িত রূপ। তীর্থভূমিতে ধর্ম-ভাবনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান ও স্থানীয় তাৎপর্য অনুধাবন সূত্রে বিষয়গুলি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। ভ্রমণকালে কেউ পুণ্য-লোভী, কেউ আবার জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে ধর্মপথগামী; সবে মিলে রানী চন্দের পুণ্যভূমি সফর হয়ে উঠেছিল আর্থ-সামাজিক ও ধর্মদর্শনের জীবন্ত পট-চিত্র।

Reference:

১. চন্দ, শ্রীরানী, ‘পূর্ণকুম্ভ’, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রকাশকাল- ২৫ শে বৈশাখ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১
২. তদেব, পৃ. ২১
৩. তদেব, পৃ. ৩২-৩৩
৪. তদেব, পৃ. ১৫২
৫. তদেব, পৃ. ৬৪
৬. তদেব, পৃ. ১৭২
৭. তদেব, পৃ. ২০৫
৮. তদেব, পৃ. ২১২
৯. চন্দ, শ্রীরানী, ‘হিমাদ্রি’, কলিকাতা ১২, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশকাল-পৌষ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০
১০. তদেব, পৃ. ৪১
১১. তদেব, পৃ. ৪১
১২. তদেব, পৃ. ৫৩
১৩. তদেব, পৃ. ৬৭
১৪. তদেব, পৃ. ৬৯
১৫. তদেব, পৃ. ৬৯